গিলোটিনে আলপনা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জ্বর

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ুক অস্থাবর পোকামাকড়,
সাঁওতালডি’র আলোকমালার অতীন্দ্রিয় ছল,
কেউ বলেছে এবারে খুব ফসল হবে না-ই বা হলো ফসল
ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ুক দুর্ভিক্ষের অকূল চরাচর
আমি তবু এই শরীরের খড়
সংকলিত সত্তা আমার একাগ্র পবিত্র ক’রে রাখি
‘আমাকে ভোগ করবে তুমি’–ব’লে জ্বালাই শেষ দু’টি জোনাকি!

দ্ব্যর্থ-আলো

ঈশ্বরের অন্তর্বাস খুলে
তারা দেখবো তারা দেখবো আমি
মানবো না আর প্রথার সপ্তশতী
সুবচনীর ব্রত অনেক হলো
কোপার্নিকাস যা-ই বলুন না কেন
ঈশ্বরের অন্তর্বাস ছিঁড়ে
তিনশো রকম সূর্য দেখবো আমি
বলতে গিয়ে দেখি হঠাৎ তুমি
আমার নগ্ন, আমার পুণ্যলতা,
হেঁটে যাচ্ছো ভিড়ের মধ্য দিয়ে
নারীর হাতে এ কোন্ কমণ্ডলু
প্রশ্ন করে টালিগঞ্জের মানুষ
ঈশ্বরের ভীষণ-মুখোমুখি
দাঁড়িয়ে তোমার নীল আহুতি দেখি
বিল্বপাতায় সিঁদুর মাখামাখি
স্পর্ধিত পা ঘুণ-ধরা ঘট ভাঙে
কলকাতার ভিড়ের ভিতর থেকে
এখন শুধু তোমায় দেখবো আমি॥

বিষাক্ত শিশির

গোটা ব্যাপারটাই আমার উপর নির্ভর করছে
ঐ শরীরশীর্ণ মেয়েটিকে আমি ভালোবাসবো কিনা।

দুপুররৌদ্রের লিটার-লিটার মদ গিলে
দোতলা-বাসের একদেশদর্শী উন্মত্ত কুঞ্জর
গীতাভাষ্যকার-লোকমান্য-তিলকের-ধরনে-আকাশ-থেকে-মাঙ্গলিক-শুভেচ্ছায়-
ঝুলতে-থাকা
একরাশ ডালপালার গূঢ় জল্পনায়
এক মুহূর্থ থম্‌কে গিয়েই আবার গর্‌গর্‌ করতে-করতে এগিয়ে গেল:
ঐ সন্ধিক্ষণের সুযোগে আমি বন্য হাতির হাওদা টেনে খুলে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে
সাদার্ণ অ্যাভিন্যুর এক রাজবাড়ির মুমূর্ষু বারান্দায়
ভীষণ-রকম ফুরিয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে প্রত্যক্ষ করলাম–
কুমারী বিধবা মিশে মূর্তি তার রবীন্দ্রনাথের নীরজা
রুগ্ন হাতে মৃত্যুর মেহেদি তার আধখোলা সিঁদুরকৌটো না ভস্মাধার
যাকে গুরু মেনেছিল দুর্ঘটনায় পরশু...
এই নারী নির্জলা সত্যের কাছে গচ্ছিত এখন
জীবনের দিকে তবু শেষবার অর্ধমাত্রায় ঝুঁকে আছে
আঙুর না আমলকি কী দিয়ে এখন আমি ওর গুরুদশা ভরে দেবো?

পাগলের কাছে কিছু প্রেমের প্রতিভা ঋণ ক’রে
আমি ওকে ভালোবাসবো কিনা
আমার কয়েক দণ্ডের সুস্থ মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করছে–
উষ্ণীষকমল আজ চিন্তার শিশিরে ভরে আছে...

খেলা

১

ভীষণ মহান শিশুরা খেলছে
বারান্দা থেকে দিগন্ত ছিঁড়ে প্রকাণ্ড মহাকাশে
সবুজ ভূর্জে আপূর্যমাণ আহার্য ব্রহ্মার

শিশুদের খেলা প্রচলিত মৃত্যুকে
প্লাস্টিকে-গড়া গণেশ ঠাউরে দুম্‌ড়ে ভেঙে দিয়েছে
একাকাশ আজ আকাশ ও মৃত্তিকা

একটি শিশুর সঙ্গে আরেক শিশুর তফাৎ
ঈশ্বরদের ঈর্ষা জোগায়
কেননা তাদের চরিত্র একাকার

আমি হোমানল জ্বেলে বসে আছি পুবের বারান্দায়,
নিঃসঙ্গতা আমার উপকরণ,
শিশুরা খেলছে অথৈ খেলছে, তাদের লীলাঙ্গন
সঙ্গহীনতা শেখেনি কখনো, ওরা প্রশংসা চায়
এ ওর সমীপে, ওদের এই ধরন

দারুণ মৈত্রী, আমি এ খেলায় যোগ দিতে পারবো না

সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে গহন রাত্রি
একঘন তবু শিশুরা খেলছে

কোন কবন্ধ-ভাটিয়ালি থেকে তোরা জোর পাস
আমাকে বলে দে
শিশুরা—অথবা ব'লে দে তোরা কি একটিই শিশু—

ভীষণ মহান্‌ শিশুরা খেলছে বারান্দা থেকে দিগন্ত ছিঁড়ে
অনন্ত মহাকাশে,
তবু এ বিষয়ে আজ কিছু বলবো না।

২

‘বৃষ্টি এলে ব্রেজিল জিতবে
আঁচল ভিজবে অন্য দলের’
বলতে-বলতে দশটি কিশোর
ছুটছিল এক পারুলডাঙার
রৌদ্রভরা উত্তরণে–

‘সর্বনাশের একই নিয়ম
আমরাও তার অংশ নেবো’
বলতে-বলতে দশটি কিশোর
দুই তমালের তোরণ দিয়ে
কোথায় গেল কেউ জানে না!

শুধু একটি মোহিনী, সে
ঘট ভরে ফিরছিল হঠাৎ
দেহের কথা মনে পড়তেই
আচম্‌কা পাঁচজনের ভয়ে
গাঁয়ের মূর্খ মোড়লকে সেই
বার্তা দিল, তার কপালে
কী আছে তা সবাই জানে,
ওরা দশজন এদিক দিয়ে
ফিরবে যখন তারাও বুঝি
শামিল হবে এক-শ্মশানে!

বিবাহবার্ষিকী

তোমার আর আমার অসুখগুলো
আমাদের আলমারির বিভিন্ন পর্যায়ে
ভাগ করে রেখেছিলাম ভোরগোধূলির
আত্মসচেতন এক অপরাহ্নে

অতর্কিতে চৈত্রবায়ে একগুচ্ছ শুভেচ্ছাসেনানী এসে
ঘুলিয়ে দিয়েছে সব-কিছু:
আমার ওষুধ তোমার অংশে আর
তোমার ওষুধ আমার–
তারপর থেকে এক সমন্বিত উজ্জ্বল অসুখ
(ওরা তাকে ভালোবাসা বলে)
ছন্ন করে দেয় যতো স্বাতন্ত্র্যের বোধ
যার মধ্যে ভালোবাসবার ভিত্তি

আমার দুজন ব্যক্তি নই আর–একাকার সত্তার আহুতি–
ভালোবাসবো কী করে তাহলে?

অথবা তৃতীয় পাত্র বেছে নেবো দীক্ষাগুরুটিকে
যেজন অমেরুদণ্ডী অর্চনা চেয়েছে আমাদের
জহ্নুসপ্তমীর রাত্রে যে তার থাবায়
তোমার কপাল জুড়ে চন্দন মাখাতে চেয়েছিল?
ভাবতেই শির্‌শিরে এক অন্ধকার ডানার ঝাপটে
আমাদের দুজনকে দেয় আবার বিচ্ছিন্ন করে:
জন্ম নেয় ভালোবাসা তার রং কপট গেরুয়া

তুমি দাঁড়াও দুহাত মেলে দুই দেহলির মাঝখানে
রথের মেলায় আমি দু-তিন হাজার বন্ধু নিয়ে এইবার
ভিড়ে যাবো বাড়ি ফিরতে আজ কিন্তু দেরি হবে খুব

তুমি একা আগেভাগে খেয়ে নিয়ো, অসতীরা বলুক অসতী...

ঘরোয়া

আমন ধানের চন্দন থেকে নিঃসৃত রোদ্দুরে
তোমাকে স্নান করাই
বহুদিন ভালোবাসার কবিতা লিখিনি দিনদুপুরে

অন্যেরা গেছে ময়দানে আজ সেমিফাইন্যাল খেলা
আমি শুধু সারাবেলা
স্বীকার করেছি পরাভব: বিজিতের অধিকার চাই

আমি অংশত এগিয়েছিলাম তবুও তোমাকে হেসে
এগিয়ে যেতে দিলাম
তুমি জিতে গেলে ঘরোয়া খেলায়, যদিও কন্যারাশি

জিতেছো, তবুও মুখে
প্রতিস্পৃহার অহমিকা বাজে, কালো এক কৌতুকে
তুমি একা বসে আছো দর্শক নিঃসীম গ্যালারিতে

তুমি একা? নাকি তোমার সঙ্গে কন্যকা! তার হাতে
আমন ধানের ঘ্রাণ
আঁধার হবার আগেই আমরা তোমাকে করাবো স্নান!

নক্তাক্ত

নক্তাক্ত ছেলেটি একা হেঁটে যাচ্ছে,
রাত্রিকে মনোনয়ন করেছে সে। এখুনি সাঁকোর
রেলিঙের মরমী প্রাচ্যে
শেকড়বাকড়
পুনর্নব করে নেবে–আমাকে প্রশ্রয় দেয় না একদা যেহেতু
ভোরবেলাকার বৈতালিকে
অংশত ভিড়েছিলাম–সে যাবে একাই, এই সেতু
সাহায্য করুক ওকে। রাত্রিকে মনোনয়ন করেছে যদিও
রাত্রি তাকে করেনি স্বকীয়;
ভাবি আমি তার কথা বলবো, না বলবো না রাত্রিকে!

ওরা এভাবেই স্থির করে নেয়

আমাকে আব্‌ছে রাখো অষ্ট দিক্‌পাল
ইন্দ্র অগ্নি যম
বরুণ মরুৎ আর কুবের ঈশান

আরেকজনের নাম
এ মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছি বলে
আমাকে আচম্‌কা ওরা ঠাউরে মিল নশ্বর পুতুল!

বিনিময়

ক্রমশই বেড়ে ওঠে আমার নিজস্ব এই জনহীন গ্রন্থাগারে
শিল্পের বিষয়ে গ্রন্থগুলি,
গথিক গির্জায় স্তম্ভ যেরকম অরণ্যগ্রন্থিল
আমাকে অচিরে গ্রাস করে নেবে, তাই নিম্নদরে
পুরনো বইয়ের কোনো দোকানীকে দিয়ে দেবো ডেকে,
মাঝে মাঝে এক-একটা বই
ধার করে নিয়ে পড়বো তার কাছ থেকে:
তার সঙ্গে অনর্গল কথা বলবো ব্যস্ত সে যতোই–

সং

ব্রিজের বাঁ-দিকে বড়ো করে লেখা আছে
‘শেখর ভীষণ বোকা’

রোজ দু-দুবার তা দেখে ভোঁদড় নাচে
স্কুলের ছেলেরা, ‘শেখর ভীষণ বোকা’

বলে ঘুরে যায় হাওয়ার গরজে। এবং রেলিঙে-ঝোঁকা
কিশোরীরা দ্যাখে, অংশ নেয়না, শেখরকে ওরা বোকা

বলে না, যেহেতু শেখরকে ওরা কেউ
জানে না—ফাজিল ছেলের দলের ঐ খলনেতা সে-ও

শেখরকে কোনো জন্মে দ্যাখেনি, তবু সে-অনির্ণেয়
চরিত্রটিকে মূর্খ সাজিয়ে সাজে

নিজে-নিজে এক অমূর্ত চতুরালি
দুটো সাইকেলে ফড়িংয়ের ঢংয়ে আসে-যায়, হাততালি

দলের সবার থেকে পেতে হবে, পেয়ে যেতে হবে খালি,
তার এই শাস্তি, সর্দারি থেকে ঝরে-ঝরে যায় বালি॥

পুড়ুক আমার কুশপুতুল

জানাজানির ভয়ে
আমি তোমায় স্বনির্মিত সিংহাসনে বসিয়ে রেখে তুমুল
চামর বুলাই তখন রাত্রিবেলা

জানাজানির ভয়ে
কালাপানি পার হয়ে যাই, তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে ছিল তুতুল
–জামদানি গায়ে–জানতেও পারল না

জানাজানির ভয়ে
আমি হঠাৎ সাঁৎরাগাছির বৈষ্ণবদের গোপন গ্রন্থাগারিক
মুখে আমার বুর্জোয়া ভদ্রতা

জানাজানির ভয়ে
তোমাকে খুব তুচ্ছ করে জমে আমার ইস্কুল মাস্টারি
বাঁকুড়ার এক গ্রামে

পার্বতীহরশৃঙ্গার প্যানেল
ট্যুরিস্ট যখন চুরি করে কাউকে আমি বলতেই পারি না
জানাজানির ভয়ে

ভারতবর্ষ থেকে
অদূর-দূরে অতীন্দ্রিয় আদিখ্যেতায় পণ্ডিচেরীর সেই
কবিবন্ধুটিকে
ফিরিয়ে যেই আনতে গেছি আমার গভীর কলকাতা-বন্ধুরা
পোড়ায় আমায় কুশপুতুল এবং আমার নিজস্ব পুরাণ
দিকে-দিগ্বিদিকে

জানাজানির ভয়ে
জয় করি এক গীতিকাব্যের ক্ষুদ্র প্রদেশ গহন রাত্রিবেলা
আমার তখন ঘুম পেয়েছে খুব

পুড়ুক আমার কুশপুতুল আস্ফালিত চন্দনের ধূপ

শিল্পী ও সঙ্গিনী

ভূপ্রদক্ষিণে যেমন সরল দ্বন্দ্ববিহীন চতুর্থদিন
পড়ে-যাওয়া রোদ মাদুর-বিছানো উপত্যকায়
প্রজাপতিদের প্রতিযোগিতায় অনার্দ্র এক মুখ ভেসে যায়
পাহাড়ি স্টেশন, চা খেয়েছি এই একটু আগেই,
অনার্দ্র মুখ আমাকে বলল আর কথা নয়
ট্রেনের এখনো ঢের দেরি আছে এসো গল্‌ফের মাঠে খেলতে চলবো
বলতে বলতে আরো প্রগল্‌ভ আরো প্রগল্‌ভ

চুম্বন দিতে পারবো না তার মুখের লোধ্র
স্বহস্তে এঁকে দিয়েছে রৌদ্র
তাছাড়া আমার কাজ পড়ে আছে আজকের দিন
ভেঙে আরো কিছু গড়া যায় কি না

ঢুকে যাই তাই গল্‌ফ-মাঠের একটি রন্ধ্রে
পেন্সিল দিয়ে খুঁচিয়ে তাকেও গুহাকন্দরে
পরিণত করি, আজকের মতো এই আনন্দে
আমার মুক্তি, ট্রেন চলে যায়, অনার্দ্র মুখ ক্রন্দন করে–

একটি বুদ্বুদ

একটি বুদ্বুদ ফুটে উঠেছে সদ্যই
এক্ষুনি হঠাৎ ফেটে যাবে
আমাকে ডেকে এনেছে পাড়ার ছেলেরা
এই বুদ্বুদের গায়ে বেগ্‌নি-কালো রং দিতে হবে

যেন পুরোহিত আমি, নশ্বরতাকে নশ্বরতা
জেনে তবু ধর্মায়িত করে যেতে হবে

'শিল্পী বুঝি পুরোহিত?'—এই বলে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে
পালাবার চেষ্টা করি, ছেলেরা আমাকে ধরে আনে

আমি বুঝি নিজেই বুদ্বুদ?

জেনে নেওয়ার মানেই মৃত্যু

হিন্দি গোয়েন্দাছবিতে হেলিকপ্টার তের্‌ছা হয়ে এসে পড়লেই বুঝে নিতে হয় ফিল্ম শেষ হয়ে আসছে, আমি সেভাবেই, পূর্ব-অবগত, বসেছিলাম প্যাগোডা-আকৃতি গাছের তলায় পেন্সনলুব্ধ পার্কের বেঞ্চিতে–ছায়া পূর্বগামী; মেয়েটি, অন্যদিকের বেঞ্চিতে তার প্রেমিককে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে চুম্বন করছিল, আর তখুনি আমি ধরতে পেরেছিলাম, বিশ শতক ফুরিয়ে আসবার আগেই, তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে আসবে। একথাটা ওদের জানিয়ে দিলে কি ভালো করতাম?

টুকরোগুলো জড়ো করতে গিয়ে

গাছের কোটর তোরণ ভেবে মুকুট নামাই।
নিচে
নদী বইছে, তাকে
ঈশ্বরের ডানহাত ভেবে এগিয়ে দেখি বিছে
ভেসে যাচ্ছে তা-ও সরাতে বিবেকে আজ লাগে

প্রজাপতিরই অংশ যেন।
কোটরে-রাখা মানবকরোটি যে
দেবদূতের টুকরোখানি। এসব জড়ো করতে নিয়ে জাগে
ভুরুর কাছে শিশির, সম্ভ্রম

এবং আমার নির্ধারণে বিচার করার সময় ভীষণ কম:
গাছের কোটর তোরণ ভেবে কিরীট নামাই নিচে

নশ্বরের হাত

আমার হাতের পাতার নিচে পল্লী এক
বনবাদাড়, জনপদের খুশি

আমার হাত এক বিঘৎ ঈষৎ মেঘ, ছায়া দিচ্ছে
হাত সরালে রৌদ্র হবে খুব

তবুও আমি কী ক’রে বলো হাত সরাই, হাত সরালে
সে একরকম দায়িত্বহীনতা

বরং আমি নিজেকে নিজে সরিয়ে নিই, বিবিক্ত এই হাতের মেঘ
ছায়া ছড়াক অন্তত এক গ্রাম ও গ্রামীণ মুখের উপর

ফ্রেস্কো

চলন্ত দেয়ালি দেখে চম্‌কে উঠি, আমার দিকেই
এগিয়ে আসছে পুঞ্জ দীপমালা, হঠাৎ-হঠাৎ
ব্যাসার্ধে বিকীর্ণ হয়ে পরক্ষণে এক পূর্ণতায়
ভেঙে যায়–চারিদিকে রাত্রির বারিধি একাকার
তারি মধ্যে অনিকেত নৌকার দীপিত রশ্মিগুলি
গড়েছে অলাতচক্র যেন–আমি একসঙ্গে এত
দৃপ্ত সমাহার আগে কখনো দেখিনি, আলোগুলি
কম্বুরেখা চূর্ণ করে সরল মিছিলে এইবারে
কাছে এল, লাল সালু দিয়ে মোড়া কার্বাইড-আলো,
আলোকবাহীরা আর কেউ নয়: ধ্বস্ত অবসন্ন
দশজন ফুচকাওয়ালা একা-একা দিনের পসরা
চুকিয়ে বস্তিতে ফিরছে সংহতির মৌন উদ্ভাসনে॥

ক্রমান্বয়

একটি পাখি ডেকে উঠল উনিশ-মিটারব্যাঙেৃ;
একটি শিশু ককিয়ে ওঠে; 'আমায় ভাতের ফেন দে';
একটি মানুষ নিখোঁজ, তাকে পাওয়া যায়নি ব'লে
এ পর্যন্ত ওঠেনি কারো হৃদয় খুব জ্বলে,
জ্বলে উঠলেও ছাই হয়নি–ক্ষিপ্র প্রতিবাদে
মৃত্যুকে ঈশ্বর ঠাউরে উঠে গিয়েছে ছাদে
আরেক মানুষ–নাম জানিনা–কার্নিশে খুব ঝুঁকে
কুর্নিশ জানাতে যাচ্ছে অনন্য মৃত্যুকে
যার ভিতরে সব ঘটনা এবং চরিত্রের
স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে, ভাবতে গিয়ে ঢের
দেরি হয়েছে, এবেলা আর মরবে না ও ভেবে
উনিশ-মিটারব্যাঙে পাখি আনন্দসুর দেবে.....

আমি আর হবো না জনক

সৃষ্টিমুখী নই আজ ভোরবেলায়
হাত থেকে ঝরে যায় ঝরে-ঝরে যায়
অবিরল চিত্রকল্প
এবং প্রতীক যতো জমিয়ে রেখেছিলাম যে-সমস্ত উপমা অমোঘ
অপ্রগল্‌ভ
ঝরে-ঝরে যায় তারা ব্যক্তির গৃহীত পরাভবে
আমাকে অপৌরুষেয় সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে হবে
আমি তার হবো না জনক

বৃক্ষ এক উপলক্ষ

গাছটার গায়ে একটি ডাল
হুবহু হাতল যেন–
এইবারে গাছটিকে তুলে ধরো কাচের গ্লাসের মতো
মেলে ধরো রুগ্‌ণ দেবতাদের উদ্দেশে
এবং তাঁদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেবার কল্পে
বৃক্ষের নির্যাস তুমি পান করো

প্রলয়

ঢেকে যায়, বেঢপ সিঁদুরকৌটো, গহীন তুষারে;
দৈত্যের প্রেমিকা সেই উৎস থেকে টেনে নিত তার
বিনোদ সিঁদুর
পরে নিত দিগন্তবিসারী ভালে

দেবতারা সেই দেখে য়্যুক্যালিপটাসের ডালে-ডালে
বাসনায় জড়ো হয়ে ঈর্ষায় কাঁপত

আজ তার প্রেমিক নিহত, তার আরব্ধ বিবাহ
অসমাপ্ত,
সংক্রান্তির অন্ধকারে তুষারমানবী বুক ঢেকে
ঘুমের ভিতরে জেগে
একসঙ্গে ধরে আছে গর্ভগৃহ আর গৃহদাহ

অনুত্তরণ

পৌঁছিয়ে প্রায় গিয়েছিলাম লক্ষ্যমাত্রায়–
‘জয় ব্রহ্মার মন্দির জয় তোমার সোনার চুড়ো’
বলতে বলতে মুখের মধ্যে আকন্দ ধুতুরো
ঢুকে গেল, মুমুক্ষা তার পথের কুশাংকুরও
লুপ্ত করে এই ভেবে সব কায়িক প্রতিরোধ
মুছে দিলাম, তবু আমার ডানার শৃঙ্খল
জড়িয়ে থাকে, যতোই খররোদ
গলিয়ে দেয় গালায়-তৈরি আমার ডানা, ততোই গায়ে বাজে
একটুখানি কাঁটার বিয়োগফল;
কাঁটার শেকল হোক তাহলে সঙ্গী আমার: নিছক নগ্ন বোধ॥

মোম

যে সব প্রগাঢ় ধূপ জ্বলে-জ্বলে আমার স্বভাবে
ঈষৎ পৌরুষখানি রেখে গেছে, আজ মনে ভাবি
সে সব ধূপের নাম মনে নেই কেন? মনস্তাপে
যে সব মৃত প্রদীপ উজ্জীবনে দারুণ মেধাবী
হয়ে উঠেছিল আজ মনে নেই নামের হিসাবে।

শুধু মনে পড়ে, আমি তোমার ভ্রূবল্লীর তোরণে
প্রেতার্ত শীতের রাত্রের যে সমস্ত স্বপ্নভাষী মোম
জ্বেলেছি, তাদের নাম—প্রত্যেকের নাম; সঙ্গোপনে
সে সব মোমের মৃত্যু ঘটিয়েছি আমি, তাই মনে
প্রত্যেকের নাম আজও রয়ে গেছে ভীষণরকম।

আমি এরকম দুটি মোমের ঘটনা বলে যেতে
এসেছি এখানে; আজ সতেরো বছর ঘটে গেছে
ঘটনাকালের পর: এ দুটি ঘটনা যে-ঘরেতে
ঘটেছিল (পর-পর দুইদিন) সে ঘরের মেঝে
এখনো মোমের দাগ বহন করছে বুক পেতে।

ঘটনামুহূর্ত থেকে সতেরো বছর পরে যদি
প্রত্যাগত আততায়ী তার সেই মেরুন পাপের
এজাহার দিতে আসে তাহলে কি সুবিচারপতি
অব্যাহতি দেবেন না? তাহলে কি পাতকের জের
আজীবন? পাপ বুঝি ঈশ্বরের চেয়েও তীক্ষ্ণধী?

তিব্বতী প্রবাদে বলে মানুষের পুণ্য আর পাপ
প্রচ্ছন্ন উৎসাহে চলে সঙ্গে-সঙ্গে, যেখানে সে যায়,
সেইমতো, অগ্রণী পুরুষ জয়কেতন ওড়ায়
নিজে অর্ধনমিত সে, তাকে টানে নিজস্ব ত্রিতাপ।

আমি পুণ্য আর পাপ এ দুই বন্ধনদশা থেকে
তৃতীয় বন্ধনী খুঁজি—সে কি প্রেম? প্রেম স্বভাবত

প্রথম-দ্বিতীয় দুই বন্ধনীর উপরে সতত
নির্ভর করেছে, করে, শত শত আহত সংগ্রামী
প্রেমিক দেখেছি আমি প্রেমিকার দুপায়ে আনত।

আমিও আজানু হয়ে কেঁপেছি দ্বিতীয় রাত্রে তার
পদমূলে—কিন্তু তার পূর্বরজনীর কথা আগে
বলা ভালো:
মাঝরাত্রে আমি লাজবন্তী সুভদ্রার
ঘরের ভিতরে ঢুকে আকস্মিক আক্ষেপানুরাগে
বলেছি: ‘তোমাকে আমি নিয়ে যাবো, নিছক তোমাকে’—
‘কোন্‌খানে’
‘যেখানে আমার খুশি’ ‘এখন সবাই
ঘুমিয়ে রয়েছে, কাল ভোরে চলো’
‘এখনি, কেননা
মুহূর্ত ফেরে না আর’
‘বেশ তবে চলো, কোনোজনা
জানতে পারে না যেন, সতর্ক প্রণাম এঁকে যাই
গৃহদেবতার পায়ে’
দেখি যা আমার শঙ্কা, তাই,
প্রণাম করতে যেই নত হলো শাড়ির বিদ্যুতে
একটা ইঁদুর দৌড়ে জলের কলসে বাধা পায়,
জেগে ওঠে দশজন সশস্ত্র প্রহরী, বারোভূতে
সারারাত্রি সংকীর্তন, তোমার সৌজন্যে, বারান্দায়
অতসী গাছের ঝাড়ে লুকাই, বিব্রত অপ্রস্তুতে।

আমি বারান্দায় এসে একফাঁকে, ঘড়িতে তখন
রাত তিনটে (সাড়ে তিনটে?), আলটপকা আমাকে বললে
‘পালাও, পালিয়ে যাও।’ আমি তীব্র অভিমানে জ্বলে
পালিয়ে গেলাম, আমি নিজেই মোমের মতো গলে
মিলিয়ে গেলাম সূর্যে (তুমি বলবে ভুল উদ্ভাসন?)—

একটি মোমের মৃত্যু এইভাবে। কিন্তু অন্যদিন
আরেক মোমের জন্ম। প্রতিশোধপ্রবৃত্তি আমার

স্নায়ুতে ছেয়েছে, যেন ন্যুজ ভিখারিণীর কানীন
শিশু কেড়ে নিয়ে গেছে এক শ্রেষ্ঠীর নিপুণ ঠিকাদার
শীতের ভীষণ রাত্রে, এইবারে তার সমুচিত
প্রত্যুত্তর দেবো আমি, রাত্রি হলে আজই, এই ভেবে
অজস্র উত্তাল সুখে ভরে থাকি সারাদিন ব্যেপে,

‘আজ রাত্রে তাকে দেবো শীতের চরমতম শীত’
একথা ভেবেছি, আর রাত্রি হলে নীল নক্‌শা মেপে
ঢুকেছি আবার তার কক্ষে, দেখি আজ সে প্রস্তুত,
প্লাস্টিকের ঝাঁপিতে দু’খানি শাড়ি কলাপাতা-রং,
খবরের কাগজে মোড়া সুপার মার্কেটে কেনা জুতো
বিচ্ছুরিত করে আভা, আমাকে দেখেই পরিপ্লুত,
বলে উঠি: ‘নিয়ে যেতে এসেছি তোমাকে, কক্ষচ্যুত’
‘কোন্‌খানে’
        ‘যেখানে তোমার খুশি’
                        ‘এখন সবাই

ঘুমিয়ে রয়েছে, চলো, দেরি নয়।’
                        ‘কে বলে ললনা
কৃতঘ্নতা?’
        ‘অনেক হয়েছে, চলো’
                        ‘যেন কলোনির কোনোজনা
জানতে পারে না’
        ‘আহা, জানুক, প্রণাম করে যাই
গৃহদেবতার পায়ে একবার’ বলে যেই স্বল্প আরাধনা
করতে গিয়েছি, আমি সন্তর্পণে লোহার ফটক
খুলে একা পালিয়ে এসেছি পরিকল্পনার রাতে
জামির লেনের সেই সন্দেহের মতো ছোটো মাঠে
দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে আরেকটা মোম বামহাতে
ছুঁড়ে দিয়ে সরে গেছি, সে মোমের সুমসৃণত্বক
সূর্য ছুঁয়েছিল কিনা জানা নেই, সূর্য শুধু মোমের আগুন
ছুঁয়ে দ্যাখে, দ্বিধাদ্বন্দ্বমেদমজ্জাজড়িত পিচ্ছিল

মোমের শরীর সে কি ছুঁয়ে দ্যাখে? আমি অনাবিল
ভেবেছি নিজেকে, কিন্তু আমি নিজে সে-মোমের ভ্রূণ
হননে প্রধান পাপী, জেনেছিল রাত্রির নিখিল।
নাকি আমি বীতপাপ? মোমের মতন সারি-সারি
আমি কি নিজেই জ্বলে উঠেছি একদা? যে আমাকে
ভালোবাসে আমি তাকে–যেহেতু সে একান্ত আমারি–
অবহেলা দিতে পারি? তাহলে মোমের সঙ্গে নারী
শুতে কি কখনো পারে? আমি এক নিশীথনিদাঘে
মোমের মতন গলে পালিয়ে এসেছিলাম চলে;
আসলে পুরুষ ছাড়া মোম নেই, নারী প্রেম নয়,
নারী মোম নয়, শুধু পুরুষ মোমের মতো জ্বলে
গলে যায়, দ্রব হয়ে প্রেম বলে অবিহিত হয়,
এবং সহসা সৎ শুভেচ্ছায় স্বার্থের ফাটলে
মোম জ্বলে। মহাযানী পুরুষের প্রেম ক্ষণে ক্ষণে
হিংসা ঘৃণা প্রত্যবায় করে বসে, সমস্ত জেনেও
দু'বাহুবিহীন মোম সুষুম্নার রত্নচ্ছায়াতলে
ফিরে এসে জ্বেলে ধরে প্রেমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ স্নেহ॥

বালক

পানিফল এইমাত্র ছাড়িয়ে খেয়েছে আর তারপর দ্যাখে
মস্ত অজগর সাপ নীল আকাশে কুলোপানা চক্কর মেলছে;
নরক গুলজার করছে রোয়াকি যুবক সাত-আটজন
একটি নারীকে নিয়ে; ভুলেও কখনো তারা বাড়িতে যাবে না।

অধিকন্তু সে দেখল, ধর্মতলা থেকে এক ডবল ডেকার
যকৃৎ উন্মুক্ত করে পড়ে আছে, দু’তিনশো পাখি
ছিঁড়েখুঁড়ে চেটেপুটে শবাহারে লিপ্ত হয়ে আছে;

ভাই তাকে দিয়েছিল পানিফল—দুপুরবেলার পানিফল—
তখুনি ছাড়িয়ে কেন খেতে গেল, বুকের ভিতরে
রেখে সে দিল না কেন পানিফল, ঠাণ্ডা মফস্বলে!

প্রতিশোধ

ওরা যখন রাস্তায় লোক জড়ো করে বলাবলি করছিল
আমার আজকাল খুব সদ্বিবেচনা হয়েছে
আমি নাকি সুশীল সব কুশীলবের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে
লোকায়ত শুশ্রূষার প্রহসনে মেতে উঠতে পারি;
ফুলদানিগুলিকে আমি জলসত্রের প্রযোজকদের দিয়ে বসে আছি
জলপাত্রের ঘাটতি বাড়লে যেন কাজে লাগাতে পারে;
ঘুমোতে যাবার আগে আমি নাকি
আমার চশমাটাকে প্রায়ান্ধ মানুষদের ব্যবহার করতে দিই;
ওরা যখন গোটা এলাকা মাথায় নিয়ে চেঁচাচ্ছিল
আমার ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয়েছে,
আমি মুখচোরা সময়ের মত একবার একটু চলতে শুরু করে
পরক্ষণেই আচম্‌কা উজিয়ে গিয়ে
আমার বয়সটাকে দুর্গাটুনটুনি পাখির ঠামে উড়িয়ে দিলাম॥

বীজাঙ্কুর

স্বরচিত শস্যের শহরে
তুমি পৌষে অঘ্রানে নানারকমের বীজ
ছড়িয়ে দিয়েছো, তারপর
দৃশ্যান্তরে সরে গেছো
একবারও চেয়ে দ্যাখোনি শস্যের শহর
–যা তোমার নিজের প্রণীত–
কীরকম দেখতে হয়েছে
বছর-বছর গেছে বেজে
চরাচর
ঘুরে এসে তুমি উপনীত
স্বরচিত শস্যের শহরে, তার ব্রিজ
তোমার আততায়ীর নামাঙ্কিত;
তার সব রাস্তায়-রাস্তায়
তোমার অবন্ধুগুলি হুলিয়া বাজিয়ে হেঁটে যায়
তোমাকে যে ধরে দেবে তার পদোন্নতি নির্ধারিত

বয়স

১

পথে জেগে ওঠে ক্ষণিক চ্যাপেল, আর তার মুখোমুখি
গোধূলি আকাশে মধুবনী-পেইন্টিং

আসন্ন শিবরাত্রি এখানে প্রতীচীনগরে, আমি
আরো একবার বিশ্বাস করি বিশ্বনাগরিকতা

গাড়িতে তিনটি হিচহাইকার আমস্টার্ডমগামী
আমি শেষবার আমার ছাত্রবয়সের দিকে ঝুঁকি

উলঙ্গ এক রঙ্কুহরিণ মেলে ধরে তার শিং
নাচায় আমার দ্ব্যর্থক নীরবতা

বিল্বপত্র আমার দুহাতে অসুখের মতো কাঁপে

২

‘নাঙ্গাপর্বত’ প্লেন (এয়ার ইণ্ডিয়া), চেয়ে দেখি
মঞ্জিষ্ঠা-অধরওষ্ঠে নানা ধরনের ভিক্ষুনারী
ঈথারসাঁতারে মাতে;
এরি মধ্যে প্রসাধনহীন
আমাদেরই প্রদ্যুম্নের বোন—এই রেডিয়াম ভট্টাচার্য—
(হঠাৎ-আলাপে যেন বেজে উঠল স্নায়ুর মন্দিরা)
শারীরবিজ্ঞানী রেডিয়াম
হানোভারে গবেষণা করতে চলেছেন: শরীরের
কতোটা বিশ্রাম চাই ঘুম চাই কর্মযোগ চাই
কাকে বলে এনজাইম এসব বিষয়ে তার কাছে
পাঠ নিতে থাকি (ঐ, ঐ যে দেখুন পিরামিড
ভুল করে পামিরের মালভূমিতে যেন’, রেডিয়াম
বলে উঠল) হতে পারত আমার দ্বিতীয় বোন, না হলেও আমি
তার এক অগ্রজ নিশ্চয়ই।
তার দৃপ্ত শীর্ণ হাত থেকে অতিরিক্ত ভার

কেড়ে নিয়ে মাথার উপরে রাখি স্বযাচিত আশীর্বাদ,
আমি–এক মানবিক প্রাণী–

৩

এমন-কি আমারও
ছড়ির নিচে অ্যাসফাল্টের দাগ
বয়স হলো বয়স

অ্যাসফাল্টের নিকষ কালো ফাগ
ছড়ির বিষুবরেখায়
উঠবে যখন সেই হবে শেষ পরশ

কে যে আমায় বয়স শেখায়
দোলায় তবু চোখের কাছে সোনা

এখন অপরিগ্রহ, এমন-কি গোলাপ নেবো না॥

গৃহসঞ্চার

সারারাত বাড়িটা চলবে
দিনের বেলায় মুখ বুজে
পড়েছিল কাছিমের মতো
সন্ন্যাসের উষর সবুজে,
এইবার পল্লবে পল্লবে
জেগে উঠল।
এই, তুমি দ্যাখো তো,
কে কোথায় আছে ডেকে আনো।
তোমরা তো স্লাইড-সহযোগে
ঢের-ঢের বানানো ফেনানো
বক্তৃতা শুনেছো, শাদা চোখে
চেয়ে দ্যাখো, বাড়ির ভিতরে
কারা-কারা থাকে, কোন্ ঘরে
ভিত্তির ভ্রমর নড়ে চড়ে।
ওকি, তুমি বারান্দায় কেন
থেকে-থেকে চলে যাচ্ছো? আমি
পূর্ণের পরম অনুধ্যানও
তুচ্ছ করে এ বাড়ি তোমাকে
দেখাতে এসেছি, স্পিনোজাকে
সৌজন্য করিনি, নীরজাকেও
ডাকতে পারতাম, ডাকতামই,
কেন যে ডাকিনি, তুমি বুঝি
কিছুই জানো না? ঊর্ধ্বগামী
আইফেল টাওয়ারে উঠে গিয়ে
যিনি লিখেছিলেন, ‘ভাই ছুটি,
ছেলেমেয়েদের জন্য হামি’
তাঁর মতো তৃপ্তি আঁকড়িয়ে
একা-একা ভ্রমণের পুঁথি

ভরে তো তুলি নি। তুমি তবু
আরো-বারান্দায় যেতে-যেতে
পথে কেন? যার সঙ্গে মেতে
লুকিয়ে যাবার মহোৎসবে
ধ্বংস করো মুহূর্তের গৃহ
তুমি জানো, সে আমারো প্রিয়
কেননা সে আমি, যে-বাড়িটা
চেয়েও দেখলে না তুমি, সে তো
বহিরঙ্গে ছিলো না কোথাও,
পূর্বপুরুষের এই ভিটা
তুমি না থাকলেও থেকে যেতো,
এখনো যেমন আছে, যাও–
আমিও চলেছি, আমাদের
মধ্যভাগে যতো পরিসর
সে-ই আমাদের বাড়ি, যতো
সরে যাও, মধ্যে সসাগর
পৃথ্বী কাঁপে, সমস্ত প্রহর
দুজনের সম্পর্কের মতো
পৃথ্বী কাঁপে, কোন্ সে কুবের
দু'জনের মহা-অনিশ্চিতি
অমানুষী বেদনার তেজে
নিজের মুকুটে কী-করে যে
তুলে নিয়েছেন, তাই ভাবি;
নক্ষত্রের ভিতরে বারিধি
দুলে ওঠে, সকল মেধাবী
মনীষার সৌম্য বাক্‌রীতি
গোপন প্রাণীরে করে দাবি–
আমাদের বাড়িটা চলেছে...

বইয়ের মেলায়: সাতাত্তরে

চণ্ডালেরা চুকিয়ে এল ধূমাবতীর যৌথ স্তন্যপান
সবে তো প্রাক্-চৈতালি তা-ও শহর ধুঁকছে
কারা যেন আমার মধ্য দিয়ে
টেনে নিচ্ছে প্রাণদ অম্লজান

পায়ের তলায় খণ্ড খণ্ডকবিতা যায় ক্ষয়ে
বুকের ভিতর অখণ্ড গীতবিতান বয়ে
হাওড়া সাবওয়ে
পেরিয়ে এসে ফ্লাইওভার থেকে
না-হওয়া এক বন্ধুকে নিই ডেকে
নাম রাখি ‘কলকাতা’

একটু পরেই পিছন ফিরে আর
দেখতে পাইনা তাকে
–রূপকথার পাথর হয়নি আমায় পাথর করতে চেয়েছিল–
সে আমাকে বিশ্বাসহন্তার
পদবী দিয়ে হঠাৎ কোন্ ফাঁকে
বইয়ের মেলায় কফির কাপে মুখ ডুবিয়ে অর্ধ-মার্কসবাদে
গণপরিত্রাতা

নারী না পুরুষ না ভেবে আমি মানুষকেই বিদায়চুম্বন
দিতে গিয়েছি ললাটপুঞ্জে, বিদায় নিতে গিয়ে
বরং আরো এগিয়ে আসি, আমার দেহমন
একলম্ফ চুম্বন হয়ে ভিড়ের মধ্যে যায় বুঝি মিলিয়ে.....

চিৎপুরের চৌমাথায়

ছোটো মেয়েটি কী করে একা ঘরে ফিরবে আমি দেখবো
আমার আজ ছুটি
সাহায্যের দরদী হাত বাড়িয়ে আমি দেবো না আজ
আমার খুব ছুটি
ছোটো মেয়েটি একলা-একা পথ পার হয়, আকাশে মেঘ,
হাওয়ায় সীমা, বিষ,
ভূগর্ভের ভিতরে কোন্ মহাশক্তির বিস্ফোরণ,
ভিত্তি ভেঙে নাগমুকুলের শীষ–

কেউ ওকে কুড়িয়ে নিয়ে কাছে রাখলে পাড়াপড়শী
বলে উঠবে অনতিসামাজিক,
অসামাজিক বলবো আমি নিজেও–

শুকসারীর তর্জা দিয়ে বাঁচাতে জানে ঢের
নিজেই শুধু বাঁচতে জানে না
আঁচল থেকে খোঁপার পথে যায় ঝরে ওর উজাড় ওড়ফুল

নাম কি ওর টগর নাকি এখনো কোনো নাম্নী নয়
বাসের হাতল ধরতে গিয়ে একটু আগে টের পেয়েছে দাহ
প্রদীপ জ্বালতে মানুষ যেমন কাজে লাগায় দারুণ কেরোসিন

ফেরিঅলার মন্ত্রণায় হারিয়ে যাবে তার আগেই
রাবীন্দ্রিক ধরনে ওকে একটি নাম পরিয়ে দিয়ে
পুষবো নাকি শিল্পের হরিণ?

ঐ মেয়েটি ঝনন্ তুলে চিৎপুরের চৌমাথার ’পরে
হেঁটে যাচ্ছে তবু আমার দায়িত্বহীন হাতের তেপান্তরে
বালি চিকচিক করে।

পুরোহিতদর্পণে

তাকে পাওয়া যায়নি বলল কিশোরবাহিনীর এক মুখপাত্র

তারাই নিয়ে এসেছে সন্ত্রস্ত পুরুৎ যন্ত্রবৎ
বললেন তিনি:
‘যার দাহ হয়নি কিংবা মুখাগ্নি পর্যন্ত, কিংবা যার
হাড়গোড় পাওয়া যায়নি তার দাহ করতে গেলে এক
পর্ণনর অথবা কুশপুতুল গড়ে তাকে দগ্ধ করে দিতে হবে।’
বললাম: ‘সে কি তবে কখনো ছিল না, সে কি শুধু
অমূর্ত-ই ছিল?
অথবা অস্বস্তিকর তাকে তোমরা দেখতেই পারো না?’
এর উত্তরে, সমস্বরে, পুরুৎ এবং কিশোরেরা:
‘শরের পাতায় এক পুতুল বানিয়ে তার নিরেট মাথায়
চল্লিশটি গ্রীবাদেশে দশ আর বুকে তিরিশটি
জঠরে কুড়িটি আর দুহাতে পঞ্চাশ করে একশোটি
হাতের প্রতি আঙুল দশটি ঊরুদেশে একশো উপাংশুপ্রদেশে ছয়+চার
জানু ও জঙ্ঘায় ঠিক তিরিশটি পায়ের দশ আঙুলে দশটি
সবশুদ্ধ তিনশো ষাট পলাশপাতা দিয়ে পরিশেষে
মেষরোমরজ্জুতে জড়িয়ে তাকে ঘি মাখিয়ে পুতুলের মাথে
ঝুনো নারকেল দিয়ে ফাটিয়ে দে—নারকেলের জলে
দারুণ মঙ্গল হবে পুড়িয়ে দে কুশপুত্তলিকা—’
বলতে বলতে উত্তেজনায় কাঁপছে তান্ত্রিকেরা, স্ট্রেচারে তাদের
উপলক্ষ শুয়ে আছে, মুখ আর পড়া যায় না, আয়োজন এক মুহূর্তে সারা,
ফাগুয়া লেগেছে শালবনে, ক্ষিপ্র অন্ত্যেষ্টির আলোড়নে ওরা দিশেহারা

সেজন আমার বন্ধু ছিল॥

দর্শক

আলপনার ভিতরে তুমি দাঁড়িয়ে
আলপনার আড়ালে তুমি দাঁড়িয়ে–

বহির্বৃত্তে দর্শকেরা হাসে:
বিদ্ধ করবে তোমায় কাঁড়বাঁশে।

তোমাকে আর দেখাই যাচ্ছে না,
আলপনায় গিয়েছো তুমি হারিয়ে.....

চৌরঙ্গির ফুটপাথে

চৌরঙ্গির ফুটপাথে
আমার শতাব্দীর কামধেনু
ঢেলে দিচ্ছে কালো দুধ সীসা-রঙা
যে খাবে তার মৃত্যু হবে যে খাবে না তার
মূর্খতা ভালোবাসি না

গিলোটিনে আলপনা

১

একটি পেঁচা করাত দিয়ে দেশবিভক্ত করে
দেশ না শরীর নাকি সত্তা কেউ জানে না, তার
পার্শ্বচর বিদূষকের হাতে রক্ত, রক্ত এত, এত
রক্ত কেন?

২

মাথাটা তার গিলোটিনের চেয়েও হয়তো ঈষৎ বড়ো
কিন্তু তাকে বিচার করা হয়ে গেছে,
তাকে নিয়ে এক সহস্র হাজারতর
সম্ভাবনার কথা ছিল, শান্ত্রীরা তার গলার স্বরও
রুদ্ধ করে, যেন সে এক খেলনা-মানুষ,
গিলোটিনের ভিতরে তার সেতারস্নায়ু উঠল বেজে!

৩

আমার খিদে এত প্রবল পদ্ম পেলেও চিবিয়ে খেতে পারি,
তোমরা আমায় খেতে দেবে, না যদি দাও তাহলে মহামারী,
মণ্ডলের ভিতর থেকে সাপ বেরিয়ে দংশাবে সব-কিছু:
দাও আমাদের ক্ষুধার অন্ন, সবার জন্যে মস্ত একটা বাড়ি।

৪

ধর্ষিত গোলাপ একটা পড়ে আছে–
তাকে ছুঁয়েছে একদা তার নিজের মানুষ কানের লতির কাছে
সেইখানে আজ হাত পড়েছে কাপুরুষের (মাতাল গোড়ের মালাও পরাচ্ছে!)
এমন-কি তার দোরগোড়া হায় দুঃশাসনের নিজস্ব দেরাজে

৫

অর্ধনারীশ্বর সে কি মানবতার মূল্যবোধ বাঁচাতে চেয়েছিল?
তার ছিল এক প্রহরী এক প্রজ্ঞাজাগর সাপ
দুশ্‌মনেরা গতরাত্রে তাকেই দ্বিধাবিভক্ত করেছে!

৬

এই দ্যাখো আমাকে আর কতো দেখবে দ্যাখো
আমার দেহ আমার সখীর শরীর নিয়ে প্রদর্শনীখানি
খুব অপরূপ সাজিয়েছো, দ্যাখো এমন দেহবাহার দ্যাখো,
যখন হাজার সৈন্য এসে অঙ্গুলি আল্‌গা করে নিল
তার আগেই তো আমরা মৃত, মৃতদেহের ’পরেও এত মোহ?

৭

ফাঁসির মঞ্চে
ঈশ্বরী এক, সকল দেহে স্তন,
শত লক্ষ নারীর যৌথ আত্মবিসর্জন
গড়েছে এই ঈশ্বরীকে, যদিও অন্ধ সে
স্তনের চোখে তাকিয়ে আছে,
একি অপার করুণা তার ঘাতকের উদ্দেশে!

অগ্নিমন্থ

যজ্ঞ থেকে ঠিকরে এল বিস্ফোরক প্রাণী

পুষেছি এই বৃষভ ঘোড়া, ঘুমোতে বললেই
এক পা বাড়ায় বিরুদ্ধতায়, চলতে বললে জানি
দৌড়ে যাবে, যেই
বাঁক ঘুরতে বলবে তাকে ভুলিয়ে দেবে নাম:
তার আর তোমার শরীর থেকে ঝরবে রক্তঘাম;
তাই তাকে বলিনে কিছু, অসীম ঘৃণার পাঁকে
ভস্মভুরু তুলে অশ্ব ঘষ্‌টায় আমাকে!

মানাগুয়া অথবা চাসনালায়

ভূমিকম্পের আগে
মন্দিরের ঘড়িতে বেজেছিল
একটা পঁচিশ, এখনো বেজে আছে

দুপুর না রাত, নেই মনে নেই, কাকে
তুলে দিয়েছি স্টেশনগামী বাসে
সঙ্গে আহা সঙ্গে কে যে ছিল

নেই মনে নেই, সময়হীন ঘড়ি
বৌধায়নে হাসে–
এখন তবে সকাল? শর্বরী?

কেউ জানেনা; ভূমিকম্পের পরে
সবাই অনায়াসে
কাঁপুক সমকালীন চরাচরে!

টর্সো

অমাবস্যার বধ্যভূমিতে বিবিক্ত এই বিবাহ
মুণ্ডবিহীন তন্বী রাজকুমারী
তার পাশে এক দর্পনীল ভিখারী
প্রেমিকেরা আনে উপহার জ্বর, বারুদ এবং বিরহ

আন্তিগোনে, মঞ্চ: কলকাতা

বিদ্যুতের হঠাৎ-অভাবে
অজিতেশ (ক্রেয়ন) কেয়া (আন্তিগোনে) সংলাপ থামিয়ে দিয়ে
নগরপ্রান্তরে এক অন্ধকার মাপে

‘কেন এত অন্ধকার’ ‘আরো কতোক্ষণ এই অন্ধকার’
একাকার দর্শকসত্তার
জিজ্ঞাসার মাঝখানে কারা যেন মঞ্চে উঠে গিয়ে

জ্বেলে দিল কয়েকটি মোম, তার সংক্ষিপ্ত আগুনে
ক্রেয়নের উত্তরীয় জ্বলে যায়, অগ্নিকাণ্ডে ঘৃতের আহুতি
আন্তিগোনে॥

নির্ধারণ

হেলমেটের উপরে তার এসে পড়েছে আকাশের ছায়া
এক মুহূর্তের জন্যে
সৈনিক হয়ে পড়েছে বিবাগী

তার সতীর্থেরা তাই বনান্তরালে
‘বিশ্বাসঘাতক’ ওকে নাম দিয়ে তিনশো মশাল জ্বালে
ঈষৎ পরেই হত্যা করা হবে কোর্ট মার্শালে
ওকে অন্তত আকাশের মেঘে সমাধি দেওয়া হোক
বলতে গিয়ে আমার হাতের মুঠি
খুলে গিয়ে বুজে যায় খুব

জ্ঞানপাপ

মানুষ, না পতঙ্গের রক্ত লেগে আছে আমার উঠোনে
জেনে নিতে ভয় করে, কেননা ভীষণ সঙ্গোপনে

নিজেকে নির্মূল করে গেছে কেউ, না-জানার পুণ্যাহস্মরণে
তাকে সম্মানিত করা ভালো। তাকে তথ্যসমীক্ষণে

ডেকে এনে আবার নিহত করা আরো বেশি পাপ–
অথচ না-জানা মানে বিবেকহীনতা, প্রাণপণে

চিন্তার কবল থেকে সরে এসে তার নির্যাতনে
ধরা দিতে গিয়ে দেখি মূল প্রসঙ্গের পরিতাপ

মুছে গেছে, নীরক্ত ল্যাবরেটরি বারান্দার কোণে–

ভিয়েৎনাম্নী

অনতি-উনিশ ভিক্ষুণী তার দুইখানি ডানা মেলে
প্রদীপবিহীন চলে যায় সাইকেলে

পথে পড়ে থাকে শ্মশান, কুকুর, মানুষ ও বসুমতী
ছুঁয়ে উড়ে যায় একফোঁটা প্রজাপতি

এই দুই ডানা কারো জন্যে না, মৃত কোনো নিক্বন
তার নির্ভীক স্তন

ছুঁতে পারবে না, ওযে বুদ্ধের প্রিয়া,
ঐ ভিক্ষুণী দু’জন ভাইকে ভালোবেসে দেউলিয়া

বিবাহ এবং বিবাহের বিপরীতে
প্রদীপবিহীন ভেসে চলে যায় জ্যৈষ্ঠে, তীব্র শীতে॥

আরেক জন্মদিনে

কলাপাতার জঙ্গলে তার সোনালি ফুটবল
আটকে গেছে জন্মদিনের দিনে
পাড়ার পিসির উঠান থেকে বকুনি শোনা যায়
‘অলক্ষুণে’ ‘মস্তান’ ‘স্বাধীন’

তাহলে আর কী-করা, এই বেগুনি ডটপেন
–জন্মদিনে-পাওয়া–
গুল্‌তি করে দিক ছুঁড়ে ঐ ফুটবলের পেটে,
একবারো আর পিছনে-না-চাওয়া

সামনে শুধু সামনে শুধু সুমুখপানে ধাওয়া
ঢেউয়ের ফণায় হেঁটে.....

গ্যুণ্টার গ্রাস, কলকাতায়

অতিথি, তবু মুখে ঈষৎ রুক্ষ রাঢ় বুলি
তোমাকে খুব সাজে,
তোমার সাজি ভ’রে দিলাম কলকাতার ধূলি

চোরে ও যুবরাজে
এ আন্ধারে ছিনিয়ে নেয় ভিখিরির মাদুলি
বৈরাগীর ঝুলি;

যার কুপন আছে
সে পায় দুটো আলোবাতাস, বিশল্য পিটুলি,
বিলোয় তীরন্দাজে–

তারি মধ্যে ভর করে কেউ একা, সদলবলে
কলম কিংবা ক্রাচে

একটু দূরে পিদিম হাতে পাতালরেল চলে

র‍্যাগিং

আমার তখন ষোলো
পিস্তলের নল থেকেই সানন্দে পান করতে হবে মদ
আমায় বলা হলো

ওরা সবাই খুনী
অসীম দয়ায় ঝুঁকে বললো: ‘নয়তো নাকে খৎ
তা নইলে পিটুনি–’

মুখে আটকে খড়
কাপৌরুষের জ্বরে তখন যাচ্ছে ভীষণ পুড়ে
দেহের অলিঞ্জর

ভয়ে আমার কান
আরক্ত যেই সাহস ভেবে চৌদ্দূন দৌড়ে
খুনীরা পিট্‌টান!

বিজয়ী

তখনই আঁজলা থেকে আজন্ম-অর্জিত জল ঝরে যায়
তুমি যাকে পরাজিত করবে ভেবেছো
নির্ধারক তার করতল
তোমার ললাট ঘেঁষে ভেসে আছে: স্নেহের উদ্যত খড়্গ

নিজে সে, আগেভাগেই, মৃত্যুর চত্বরে শুয়ে আছে

তার মুখে শুশ্রূষার জল দিতে গিয়ে
তোমার আঁজলায় কোনো জল নেই
তুমিই বিজিত

লোহার পা

রুণা তোমার পোষা কুকুর
ছুঁয়ে দিয়েছে আমার কলাবতী-রঙের পর্দা
সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠেছে ভিতরদেয়াল অতর্কিতে
বিদ্রোহ বিদ্রোহ

তুমি নিজে বিদ্রোহ ভালবাসো না
কেমন ক'রে ঘটলো তোমার প্রতিক্রিয়াশীলিত সারমেয়
তোমার অনুশাসন ভেঙে ছুঁয়ে দিয়েছে পরপুরুষের বেড়া

এখন আমি অনায়াসেই তোমার আঁকা আলপনার ব্রাহ্মীলিপি
মাড়িয়ে যেতে পারি
কেননা তাই বিদ্রোহ নিয়ম
তুমি ভাববে প্রতিহিংসা ভাববে আমি প্রতিশোধ নিচ্ছি
বিদ্রোহ আর প্রতিশোধের মধ্যে অরুণগেরুয়া সীমারেখা
জানোনা ব'লে আমার পায়ে কুণ্ঠা লাগে লোহিত লজ্জা দ্বিধা

এমন সময় তোমার কুকুর লেহন করে আমার লোহার পা

চেয়ারবদল

এতক্ষণ তুমি আমাকে চিরে-চিরে দেখছিলে
যদিও আমি জীবন্ত মানুষ, উষ্ণ, পাপের প্রতিভা, বিভাবরী

তোমার বাঁ-দিকে ‘নিরপেক্ষতা’র নীল নগরাজি, পিছনে টাঙানো
আব্রাহাম লিংকন আর মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি–

এমন সময় একটা মাকড়সা তোমার টেবিলে
আর সেই সুবর্ণ সুযোগে
চেয়ারবদল করি, এবং যখন থেকে তুমি শুধু বিচার্য আমার
আর আমি এত সহজেই বিচারক নরসভ্যতার চোখে!

তিলতর্পণ

খয়েরি হয়ে এসেছে এই ছাত্রাবাস, একদিন সময় এসে প্রত্যহ দু'বেলা ওকে স্নান
করিয়েছি, এখন এখানে কোনো ছাত্র নেই; পাড়ার পুরুৎ এসে বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টিবাসর
ঘটান সে-অব্যর্থ সুযোগে, এখানে এখন কোনো ছাত্র নেই; বেপাড়ার মুরুব্বি মোড়ল
রোজ তাড়া বরে আসে খোঁজে প্রেমপত্র/ফেরার ছাত্রের মুখ—এরই সঙ্গে যদি
ছাত্র আর প্রেমপত্র পেয়ে যায় তাহলে অন্তত একলাফে সতেরো টাকা মাইনে
বেড়ে গিয়ে এমন-কি গৃধ্রকুটিল রীডারের চেয়ে আরো একইঞ্চি উঁচুপদ ইনাম
পাবার সম্ভাবনা

এই ছাত্রাবাসে আজ কেউ সেই শুধু এক শিউলিশাদা চুল বৃদ্ধ অধ্যাপক তাঁর শরীর
নুয়ে গিয়েছে ব্যবহারবিহীন ধনুক তীর নেই ছিলা জুড়ে দ্বাপরযুগের কান্না, একা তিনি অপেক্ষায়
যদি তাঁর প্রিয় ছাত্র অরিন্দম—নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের নীলকান্ত মণি—আচম্‌কা একবার
ফিরে আসে (লোকে বলে তাকে নাকি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে আড়াই ডলার
দিয়ে কিনে নিয়েছে বলে 'মোকাবিলারত দেশদ্রোহী' 'ছন্নআততায়ী', লোকে বলে
তাকে নাকি তার গাঢ় বন্ধুরাই বিলুপ্ত করে দিয়েছে, শেষবার দেখা গিয়েছে ওর
হাতে মোরগফুলের ঝুঁটি মুক্ত এক বিশ্বের নিশান, লোকে বলে আজগুরি আরো-
নানা, তবু তো ফিরতেও পারে

বৃদ্ধ এই প্রত্যাশায় রজদভ্র উপাসনা জ্বেলে ঘুরে যান ঘর থেকে ঘরে আর
মফস্বলি দৈনিকে তখন রটে যায় তাঁকে নাকি দেখা গেছে বেথুয়াডহরি থেকে
দূরে এক গঞ্জের ব্রথেলে

মোড়ল বোঝেনা এত, বুদ্ধিজীবী নয়, তবু যতোবার আসে জীর্ণ তাঁর দেহখানি
কঞ্চি দিয়ে সযত্নে খুঁচিয়ে টিঁকে আছে কিনা দেখা যায়

ক্ষতচিহ্নগুলি যদি গুনে নাও বুঝে নেবে মোড়ল ক'বার এসেছিল!

অনধিকার

তুমি আমার থমকে-যাওয়া আবধা বয়ঃসন্ধির কিনারে
উগ্‌রে দিয়েছিলে লাতিন আমেরিকার আগুন

ফিদেল কাস্ত্রোর সামনে যেমন দশ-দশখানা উচ্চৈঃশ্রবা মাইক্রোফোন
তাদের চেয়েও আমার কাছে প্রতাপ তোমার কিছুমাত্রই কম ছিলনা

ধারণ করতে পারিনি সেই প্রবল আগুন বিলিয়ে দিয়েছিলাম
নিজস্ব কবচে শুধু একটিমাত্র অগ্নিকণা রেখে দিয়েছি আজও
সেই দিয়ে খুব কাজ চলে যায় আমার

এমন সময় দেখি তোমায় হোমিওপ্যাথি দৈনিক ডাক্তারি
চুকিয়ে ফিরে আসার পথে ফুটপাথের জ্যোতিষীকেই হাত দেখাচ্ছো
আমায় দেখে ফিরে চাইলে আমায়-দেয়া তোমার সেই আগুন

কী করে বলো ফিরিয়ে দিই? ঝলসে যেতে ভালো লাগবে তোমার?

বিসর্জন

১

নিগ্রোকে হাতে পায়নি বলেই একটি সাঁওতালিকে
বলি দিতে আজই নিয়ে গেল ওরা আরো দক্ষিণ দিকে

এই সাঁওতাল বোঝেনা সাঁজোয়াবাহিনীর ভাষা, তাকে
বোবা নাম দিয়ে নিয়ে আসা হলো একাই একটা ট্রাকে

সে বোঝে না তাকে কেন আনা হলো এত বেশি সম্মান
জীবনে পায়নি, গড় করে তাই গোধূলির দেবতাকে॥

২

খনিতে ছিল ক্যানারি-পাখি, নারী
জীবন দেখছিল
        চিকের আড়াল থেকে

এমন সময় এল দশজন করল আমায় খারিজ
অপ্রণীত পুঁথি আমার ঝেঁটিয়ে ফেলে দিল
        ঢাকুরিয়ার লেকে

ক্যানারি-নারী তখনি এল বিকচ আলো মেখে!

অপমান

‘রোমন্থরত তিনটি বৃদ্ধ
পাশের পার্কে এসে বসবেন
বিকেল ঘনালে, আমরা তাঁদের
খুব অপমান করবো ভেবেছি’

এই ব’লে সাত ভীরু সামুরাই
রাঢ় অঞ্চল থেকে উঠে এসে
দর্প দেখাতে যাবে যেই, দ্যাখে
তিনটি বৃদ্ধ আসেনি আজ,
আগেই নিহত, আর সেই পার্ক
উঠে গেছে কবে, সেখানে এখন
সি. এম. ডি. এ-র ভাঙা রাস্তায়
জল, সেই জলে শ্রাবণের ভেলা
ভাসায় শিশুরা, কারা তবে সেই
তিন বৃদ্ধকে গায়েব করেছে?
দেখে নিতে হবে, দেখে নিতে হবে
গজরায় সাত বীর সামুরাই!

প্রকরণ

একবিন্দু সরোবর হয়ে আছে
চৈতন্যের ওইখানে,
রাত্রি-নীল
জল।
কেউ যেন কাছে এসে চলে যেতে চায়।
সব জেনে তীরে-তীরে পাতায়-পাতায়
উৎসর্জনের আলিম্পন;
কম্পিত দিনরজনী চতুর্দিকে
সমুদ্র আকৃতিশূন্য, শুধু
বিচ্ছেদের প্রকরণে নিটোল একটি সরোবর
চৈতন্যে গীতিকবিতা–
নির্ণীত বিষয় নেই বলে কোনো শিশুও এখন
আপত্তি করে না যেন। প্রকরণ এখন ঈশ্বর
এবং ঈশ্বর প্রকরণ॥

প্রাণী

আমার বুদ্ধকে আমি অভুক্ত চাষীর মতো একগুচ্ছ ঘাস খেতে দেবো
যেন-বা আমার প্রাণী;
আমার বুদ্ধকে আমি যেখানে-সেখানে নিয়ে যাবো
যেন সব পার্থিবপাষাণী
তাকে প্রত্যাখ্যান করে, বুদ্ধ নিজের যাদের স্বয়ং
প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে,
জগতের অবহেলা পেয়ে তার স্থৈর্যের ঘি-রং
ঝরে গেলে ভিখারী শিশুর মতো সেজে
সে এসেছে আমার দুয়ারে;
গোপন কান্নার মতো ঘুণাক্ষরে আমার ভিতরে বুদ্ধ ঘাড়ে:
অবশেষে একদিন পুত্র সে, আমার পিতা, রাত্রির তিয়াষা,
আমার সমস্ত-ভালোবাসা॥

এখন বাড়ির পথ

এখন বাড়িতে যেতে দেরি হয়
সারা রাস্তা সাপ-লুডো, উঠে গিয়ে নেমে এসে শেষে
হেম বিষলতা-ঠোঁটে কিশোরীর কড়ি-খেলা দেখা;
আপ্লুত পাগল তার যকৃতে স্মাগ্‌লিং-করা সূর্যাস্তের
টুকরো নিয়ে অনর্গল ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছে
তার সঙ্গে ম’জে যদি হাফিজের স্বাদ পাওয়া যায়;
পানের থেকে ট্র্যানজিস্টরে সহস্রঝোরায়
সুমন কল্যাণপুর: তানপুরার ভারসাম্য ভেঙে
দু-তিনটি চিকণ ছেলে কালোয় বিকোয় ভ্রাতৃভূমি
এই কলকাতাকে;
কবিতার শেষ লাইন লেখা হয়নি সেই অজুহাতে
ঘোর-লাগা জনারণ্যে কীর্ণ বীজাণুর ত্রসরেণু
ঘ্রাণ করে স্বকীয় রক্তের মধ্যে অবভৃথস্নান,
তবুও জটার মধ্যে জোনাকির বিকিকিনি বাড়ে
হাঁটুর ভিতরে ওরা দেরি-করাবার বাসা গাড়ে–
এখন বাড়ির পথ
এখন বাড়ির পথ ঘুরে গেছে গহন কান্তারে!

॥সমাপ্ত॥